দ্য কিংডম অব আউটসাইডারস

সোহেল রানা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

দ্য কিংডম অব আউটসাইডারস

সোহেল রানা

প্রকাশনায়
গার্ডিয়ান পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫ মার্চ, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ৪৫০
পেপারব্যাক মূল্য : ৪২০

ISBN: 978-984-8254-70-7
The Kingdom of Outsiders by Shohel Rana, Published by Guardian Publications, Price TK. 450 (HC)/TK. 420 (PB) Only.

প্রকাশকের কথা

জায়োনবাদীরা ধর্ম ও পূর্বসূরিদের এক কাল্পনিক প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়ে ভূমি দখলের এক ঘৃণ্য অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ জন্য তারা আন্তর্জাতিক আইন তো দূরের কথা, নিজেদের ধর্মীয় নিয়মেরও কোনো তোয়াক্কা করছে না। তাদের একটাই মিশন– ভূমিদখল। ইতোমধ্যে তারা পশ্চিমা দেশগুলোর পূর্ণ মদদে মুসলিমবিশ্ব তথা আরব দেশগুলোর অনৈক্য ও দুর্বলতার সুযোগে জেঁকে বসেছে ফিলিস্তিনিদের ভিটেমাটির ওপর। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে একটি অবৈধ রাষ্ট্রও গঠন করে ফেলেছে; অথচ তারা সেখানে বহিরাগত ও আশ্রিত।

তরুণ লেখক সোহেল রানা তুলে নিয়ে এসেছেন– কীভাবে বহিরাগতরা ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে সাম্রাজ্য তৈরি করছে। লেখকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জনাব শাহাদত হোসেন স্যারকে, যিনি ভূমিকা লিখে দেওয়ার মাধ্যমে বইটিকে আরও ঋদ্ধ করেছেন।

পাঠকরা এই বই থেকে সমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

লেখকের কথা

‘ইহুদিবাদ’ নামের রাজনৈতিক আন্দোলন এক অপ্রতিরোধ্য প্রাচীরে পরিণত হয়েছে। এর পেছনে যেমন আছে মিথলজি, তেমনি আছে ইতিহাসের অসত্য, অর্ধসত্য ও বিকৃত উপস্থাপনা। শত শত বছরের চেষ্টায় ইহুদিরা নিজেদের মতো করে জাতিসত্তার একটি ইতিহাস দাঁড় করাতে পেরেছে, যার রক্ষাকবচ খোদ ‘বাইবেল’। এর বাইরে গিয়ে যারা ইতিহাস চর্চা করেছেন, ইহুদিদের বর্ণিত ইতিহাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। তারা ইজরাইলের মূল ধারায় চিহ্নিত হয়ে আছেন ‘নিউ হিস্টোরিয়ান’ নামে। ইহুদি সমাজে তাদের দেখা হয় ‘বাতিল’ হিসেবে।

পশ্চিমা মিডিয়া আর ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্টদের সমর্থন-প্রোপাগান্ডা প্যালেস্টাইনে (ফিলিস্তিন) ‘ইজরাইল’ নামক এক দানবের উপাখ্যান তৈরি করেছে। যে পশ্চিমের অর্থ ও অস্ত্রের জোরে ‘ইহুদিবাদ’ হতে পেরেছে প্রতিষ্ঠিত, কালের পরিক্রমায় জনমতের বিরুদ্ধে ক্ষমতায় টিকে থাকার বাস্তবতায় সেই পশ্চিমাদেরই হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন ইহুদিদের কথিত ‘ঐতিহাসিক শত্রু’ আরব শাসকরা। ১৯৪৮, ৫৬, ৬৭ ও ৭৩ এ ফিলিস্তিনিদের হয়ে ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করা মিশর, জর্ডান ও সৌদি আরবের এখনকার শাসকগণ নতুন চমক দেখাচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইলের দৃশ্যত প্রধানতম শত্রু শিয়া ইরানকে ঠেকাতে সৌদি-মিশর-আমিরাত অক্ষ ইজরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ছে। আর তাতে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা দিনকে দিন হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এককালে আরব জাতীয়তাবাদের যে গালগল্প তাদের শাসকদের কাছ থেকে শোনা যেত, তারই কফিন এখন উত্তরসূরিদের কাঁধে। জাতীয়তাবাদের মোড়কে হিরোইজমের পরীক্ষায় তারা হেরে গেছেন ইহুদিবাদের কাছে। ’৪৮-এর যুদ্ধেই কচুকাটা হয়েছে আরব জাতীয়তাবাদ, আর রাষ্ট্র হিসেবে টিকে গেছে দখলদার ‘ইজরাইল’।

১৯৪৮-এর প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধে আরবদের পরাজয় আর ইজরাইল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন নিয়ে বিস্তর আলোচনা-গবেষণা হয়েছে। ইংরেজি, হিব্রু ও আরবি ভাষায় শত-সহস্র বই বেরিয়েছে। এসব বইয়ে আলোচনার বড়ো একটা অংশজুড়েই থেকেছে ‘ইহুদিবাদ’। তবে, বাংলা ভাষায় এ নিয়ে মৌলিক বই একেবারে হাতেগোনা। এখানকার বেশিরভাগ বইতেই ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংকট স্থান পেয়েছে বেশ বড়ো পরিসরে। কিন্তু ‘ইহুদিবাদ’ ঘিরে যে বৈশ্বিক রাজনীতি আর অর্থনীতির মারপ্যাঁচ, সেই আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে সামান্যই। তাই এই বইটিতে পূর্ণাঙ্গভাবে ইহুদিবাদকে ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছি।

কীভাবে ইহুদি জাতীয়তাবাদের সূচনা হলো? প্রাচীন আমলে ইহুদি নির্যাতন ও বিতাড়নের কাহিনিগুলো কি সাজানো মিথ? নাকি বাস্তবেই এমন কিছু ঘটেছে? কীভাবে জায়োনিস্টরা আরব ভূখণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে ফেলল? আরবরা কেন ইউরোপ-আফ্রিকা ছেড়ে আসা শরণার্থীদের চাপ ঠেকাতে পারেনি? পশ্চিমারা কেনই-বা বলপূর্বক এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৈধতা দিয়ে দিলো? কট্টর

ইহুদিবাদের পেছনে কারা ঢালছে কাড়ি কাড়ি অর্থ? তাতে কার কী স্বার্থ? সহজ ও প্রচলিত শব্দচয়ন আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের জুতসই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে।

এতে ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের দুর্ধর্ষ কিছু অভিযানের বর্ণনা আছে, আছে ব্যর্থতার গল্পও। বিতর্কিত রথসচাইল্ড পরিবার কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে? হামাস নেতা খালিদ মিশাল মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরেছেন কীভাবে? ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু কি স্বাভাবিক ছিল? নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে? হলোকাস্টের মতো ত্যক্ত অভিজ্ঞতার পর কীভাবে জোড়া লাগে ইজরাইল-জার্মান সম্পর্ক? ইরাক, মিশর ও সিরিয়ার পরমাণু কর্মসূচির পরিণতি কী হয়েছিল? ইরানি পরমাণু প্রকল্পে কারা সাইবার হামলা চালিয়েছিল? ইহুদি সন্ত্রাসবাদের বিপরীতে আরবদের সশস্ত্র প্রতিরোধ কেন ব্যর্থ হলো? সবই আলোচনায় এসেছে। আছে দুই ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন– হামাস এবং পিএল’র উত্থানের গল্প, আছে ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে হামাসের প্রতিরোধ যুদ্ধের খবর ফাতাহর। বইটি ইতিহাস আশ্রিত হলেও এতে ইহুদিবাদকে ঘিরে থাকা আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কূটনীতি ও সম্পর্কের ভাঙা-গড়া ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অনেকটা গল্পের মতো করে। আর দেখানো হয়েছে ইহুদিবাদের কারণ, প্রভাব ও বিস্তার। গুরত্ব পেয়েছে ভূ-রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা পরিস্থিতি। তবে এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্যেই হলো ইহুদিরা প্যালেস্টাইনকে তাদের ভূখণ্ড দাবি করার পেছনে যেসব যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরছে, সেগুলোর যথার্থতা পরীক্ষা করা।

শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল ইহুদিদের, উলটো শিক্ষা পেল আরবরাই। প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধের পর দেখা গেল, আরবদের বিপরীতে ইহুদিরা আরও শক্তিশালী হয়েছে। ইজরাইল রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আরও বেড়েছে। ৬৭-এর ছয়দিনের যুদ্ধেও তারই ধারাবাহিকতা দেখা গেল। এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ’৭৩-এর ইয়োম কাপুর যুদ্ধেও গোহারা হারে আরবরা। এভাবেই ইহুদি ভূখণ্ডের কলেবর বাড়তেই থাকে। ইজরাইলের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিলেও আরব শাসকদের অনৈক্য, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার হিংসুটে প্রতিযোগিতার বলি হয় ফিলিস্তিনিরা।

হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতি আমার একটা বিশেষ দুর্বলতার জায়গা তৈরি হয়। ইরাক-আফগান যুদ্ধ আর প্যালেস্টাইন সংকটের খবর দেখার জন্য সে সময়টাতে টিভির পর্দায় একরকম মুখিয়ে থাকতাম। স্কুলের আঙিনায় বন্ধুদের সাথে আড্ডা হতো ইয়াসির আরাফাত, সাদ্দাম হোসেন, ওসামা বিন লাদেন, বুশ আর গাদ্দাফিকে নিয়ে। এই আড্ডার উসকানিদাতা (!) ছিল আমারই প্রিয় বন্ধু অমিত চন্দ্র পাল। প্রতিদিনই আমাকে আপডেট থাকতে হতো। কারণ, অমিতের সাথে দেখা হলেই একগাদা প্রশ্ন– নাসিরিয়া আর বসরায় কি আমেরিকানরা হারবে? সাদ্দাম কোথায় পালাল– তিকরিতে না বাগদাদে? কিরকুকের তেলের খনিগুলোর কী হবে? তালেবানরা কি আবার কাবুল দখল করে নেবে? বলা যায়, এভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির একনিষ্ঠ

অনানুষ্ঠানিক ছাত্র হিসেবে আমার অভিষেক। সেই সূত্রে অনেকের মতো আমারও ‘ইহুদিবাদ’ সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল বা আছে। কিন্তু এ নিয়ে বই লিখব, সেই ভাবনা কখনোই আসেনি।

‘ইহুদিবাদ’ নিয়ে বই লেখার পরামর্শটি দেন ফেসবুকভিত্তিক বইপড়ুয়াদের সংগঠন, পাঠশালার (পাঠশালা : সেন্টার ফর বেসিক স্টাডিস) সমন্বয়ক শ্রদ্ধেয় শাহাদত হোসেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় হাত দিই বইয়ের পাণ্ডুলিপি রচনায়। আর এই কাজটি করতে গিয়ে আমাকে গত আড়াই বছরে চার ডজনেরও বেশি বিদেশি বই, শত শত আর্টিকেল/ডকুমেন্টারি, বেশ কিছু মুভি পড়তে ও দেখতে হয়েছে। বইয়ের কাজে হাত দেওয়ার একেবারে শুরুর দিকেই গার্ডিয়ানের নূর মোহাম্মদ ভাইয়ের সাথে আলোচনা হতো। তিনি আমাকে সব ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। নূর ভাইসহ পুরো গার্ডিয়ান পরিবারের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা, শেষ পর্যন্ত তারা আমার অগোছালো লেখাগুলো বইয়ে রূপ দিতে পেরেছেন বলে।

বইটি রচনা করতে গিয়ে অনেকেই এই অধমকে বুদ্ধি, পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ পাঠশালার মাহমুদুল হাসান ফয়সাল ও লিবিয়া প্রবাসী লেখক মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহার নিকট। এ ছাড়াও পাঠশালার আসিফ আহমেদ, শারমিন আক্তার, মরিয়ম মুন্নী, তামান্না অনি, মোহসীনা মহুয়া, মেহেজাবিন মাহবুব, জহিরুল ইসলাম পলাশ, রায়হান আতাহার, কবি ওয়াসিম হক, মেহেদি আরিফ, রেসমি কাকলি, নওয়াজিশ শিউল, তাহমিনা মনি বন্ধু শরীফ, জামাল, ইমরুল, নাজমুল, ছোটোভাই জুয়েল ও শিহাব উদ্দিনসহ যারা যারা আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন– সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রত্যেকেরই নিজস্ব দর্শন রয়েছে। লেখকদেরও। ইতিহাস রচনার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে লেখককে নিজ দর্শন/দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে সঠিক তথ্য প্রকাশ করে দেওয়া। বেশিরভাগ লেখকই অতীতে এটা করেননি অথবা করতে পারেননি। বাস্তবতা হলো– ইতিহাস বিজয়ীদের হাত দিয়েই তৈরি হয়। আর হেরে যাওয়া পক্ষের কথা-কর্ম নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুঁড়ে। তবে এই বইটিতে নিরপেক্ষ উপস্থাপনার যথেষ্ট চেষ্টা ও উদ্যোগ ছিল। তারপরেও বইয়ের কোনো তথ্য বিভ্রান্তিকর, অসত্য ও অনুমাননির্ভর মনে হলে তার সংশোধন হোক আপনাদের পরামর্শেই। পাঠকদের তুলে ধরা ভুল-ত্রুটির সংশোধন আর নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আসব পরবর্তী সংস্করণে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন।

সোহেল রানা
ঢাকা

মুখবন্ধ

ইহুদিরা সবশেষ প্যালেস্টাইন ছেড়েছে বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে। তারা নিজেরাই এমন দাবি করে থাকে। প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা ছিল কয়েকশো বছর, তারও আগে এদের বসবাস ছিল মেসোপটেমিয়াতে। ইহুদিরা যখন প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড ছাড়ল, তখনও সেখানে আরও কিছু জাতির বসবাস ছিল। মানে ইহুদিরা-ই সেখানকার একক জনগোষ্ঠী নয়। মেসোপটেমিয়া থেকে প্যালেস্টাইনে এসে বসত গড়া, এরপর রোমানদের তাড়া খেয়ে বাইরের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া বহিরাগতদের এই দলটি দুই হাজার বছর পরে এসে দাবি করছে, তারাই প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের আসল মালিক! এটি তাদের জন্য স্রষ্টার দেওয়া প্রমিজল্যান্ড (প্রতিশ্রুত ভূমি)। অতীতে বসবাসের কারণে যদি প্যালেস্টাইনকে তাদের-ই ভূখণ্ড হিসেবে মেনেও নেওয়া হয়, তারপরও এমন দাবি আধুনিক রাষ্ট্রধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। এ দাবি মানতে গেলে আজকের আমেরিকা, কানাডা, কিউবা, অস্ট্রেলিয়া এমনকী নিউজিল্যান্ডে বসবাস করা লোকজনকে তাদের ভূমির মালিকানা ছাড়তে হবে। কারণ, এরা কেউ-ই এসব অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নন। এদের বেশিরভাগই গেছেন ইউরোপ থেকে এবং সেটা মাত্র কয়েকশো বছরের ইতিহাস। অথচ পশ্চিমের কিছু দেশ– যাদের এই ইহুদি তত্ত্ব মানলে নিজেদের অস্তিত্ব টেকে না, তারা বেআইনিভাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের দাবিকে সমর্থন করছে এবং অর্থ ও সামরিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইনকে নিজের করে পেতে বিশ্বব্যাপী ইহুদিরা গড়ে তুলেছে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। প্রকাশ্য হামলায় ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করা ছাড়াও তারা এ যাবৎ গুপ্ত কিলিং মিশন পরিচালনা করেছে আড়াই হাজারেরও বেশি।

প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ইজরাইলরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের কয়েকশো বছরের মারমুখী সন্ত্রাস, গণহত্যা, গুপ্তচরবৃত্তি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতা নিয়ে তরুণ সাংবাদিক ও কলামিস্ট সোহেল রানার প্রথম বই– *দ্য কিংডম অব আউটসাইডারস*। এটি মূলত রাজনৈতিক ইতিহাসের বই। ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বই পড়তে গিয়ে আপনার কখনো মনে হতে পারে এটি ফিকশন, কখনো নন-ফিকশন আবার কখনো-বা মনে হবে আপনি থ্রিলার পড়ছেন। হিব্রু-ইহুদি সভ্যতার ইতিহাস, রোমানদের তাড়া খেয়ে ভূমধ্যসাগরের আশপাশে বিশেষ করে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া এবং সবশেষ রুশ-জার্মানদের হাতে নির্যাতিত হয়ে আবারও প্যালেস্টাইন এসে স্থায়ী বসতি নির্মাণের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে সহজ ও সুন্দরভাবে। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় এসেছে সুদপ্রথা, পুঁজিবাজার ও ব্যাংকিং সিস্টেমের উত্থান। ক্রুসেডার ও নাৎসিদের হাতে ইহুদি গণহত্যা, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের ভূমিকা। আছে হামাস-ফাতাহর স্বাধীনতা সংগ্রাম আর দুর্ধর্ষ ইহুদি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের ভয়ার্ত সব অভিযানের কথা।

এটি এমন এক বই, যা রাজনীতি ও ইতিহাসের আগ্রহী পাঠকদের সমৃদ্ধ করবে। আনন্দিত করবে ফিকশনপ্রেমিকদেরও। বইটির বহুল প্রচার ও সাফল্য কামনা করছি।

শাহাদত হোসেন
অ্যাডমিন, পাঠশালা- Centre for Basic Studies

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধ ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইহুদিবাদ ৩০

তৃতীয় অধ্যায়
প্রমিজল্যান্ড ৪৩

চতুর্থ অধ্যায়
জেরুজালেম ও বাইতুল মুকাদ্দাস ৫৯

পঞ্চম অধ্যায়
যুগে যুগে ইহুদিবিদ্বেষ-বিতাড়ন ৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
আধুনিক ইউরোপে ইহুদি গণহত্যা ৮৪

সপ্তম অধ্যায়
ইজরাইলরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা ৯৩

অষ্টম অধ্যায়
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বেলফোর ডিক্লারেশন ১০০

নবম অধ্যায়
দ্বিতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ ১৩৭

দশম অধ্যায়
তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ ১৪২

একাদশ অধ্যায়
চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধ ১৫৪

দ্বাদশ অধ্যায়
হামাস উত্থানের গল্প **১৭১**

ত্রয়োদশ অধ্যায়
নয়া শতকের শান্তি পরিকল্পনা **১৮৮**

চতুর্দশ অধ্যায়
আরাফাতবিহীন ফিলিস্তিন **১৯৫**

পঞ্চদশ অধ্যায়
ইহুদিবাদের ভবিষ্যৎ ভীতি **২০৬**

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা ও মোসাদ **২২২**

সপ্তদশ অধ্যায়
মিডিয়া ও আরব রাজনীতিতে উপেক্ষিত প্যালেস্টাইন **২৬২**

অষ্টাদশ অধ্যায়
বিডিএস আন্দোলন **২৭০**

উনবিংশ অধ্যায়
পশ্চিমে ইজরাইলের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা ও অর্থ সংগ্রহ **২৭৭**

বিংশ অধ্যায়
ইজরাইল **২৯৪**

টীকা **৩১০**

পশ্চিম তীরের রামাল্লা থেকে প্রায় আড়াই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের শহর 'রাফাত'। এর ১১ কিলোমিটার দক্ষিণেই পবিত্র নগরী জেরুজালেম। ১৯৪৭-৪৯-এর দিকে ইহুদি মিলিশিয়া ও মিলিটারির হাতে যে ডজনখানেক ফিলিস্তিনি শহর ও পাঁচশোর মতো গ্রাম ধ্বংস কিংবা বেদখল হয়, তারই একটি রাফাত। প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধকালে এক অস্ত্রবিরতি (১৯৪৯) চুক্তির মাধ্যমে এই এলাকায় জর্ডানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে ছয়দিনের যুদ্ধে (১৯৬৭) আবারও এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ইজরাইল। এই রাফাতেরই এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম ইয়াহিয়া আয়াশের। সময়টা ছিল ১৯৬৬ সালের ২২ মার্চ।

রাফাত তখন কেবলই একটি গ্রাম। আয়াশের বাবা আব্দুল আল লতিফ ছিলেন সেখানকার সামান্য এক মুদি দোকানি। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় উচ্চশিক্ষা নিতে চেয়েছিলেন লাজুক ও শান্ত স্বভাবের আয়াশ। ভর্তি হয়েছিলেন রামাল্লার বিরজেইত ইউনিভার্সিটির (Birzeit University) ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। সে সময় বিরজেইতের ক্যাম্পাস ছিল ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের আঁতুড়ঘর। একসময় ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। গ্রাজুয়েশন করতে আয়াশ এবার যেতে চাইলেন জর্ডানে, কিন্তু দখলদার ইজরাইলের তরফ থেকে অনুমতি মিলল না। প্রথম ইন্তিফাদা শুরু হলে, তিনি চিঠি লিখলেন ইজ্জেদিন আল কাসেম ব্রিগেডের মার্টায়ার শাখাকে। হামাসের সশস্ত্র শাখা এটি। আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে কীভাবে ইহুদিদের কাবু করা সম্ভব, চিঠিতে তারই ব্লুপ্রিন্ট ছিল। একসময় আয়াশ জড়িয়ে গেলেন কাসেম ব্রিগেডের সঙ্গে। তার কমান্ডে নতুন উদ্যমে ইহুদি স্বার্থগুলোতে আঘাত হানতে শুরু করল মার্টায়ার শাখা।

ছদ্মবেশ ধারণে এই ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীর ছিল বিশেষ দক্ষতা। প্রতিদিনই নতুন নতুন পোশাক আর বেশভূষায় তাকে দেখা যেত। কখনো দেখা যেত ইহুদি সেটেলারের ভূমিকায়, আবার কখনো তেলআবিবের রাস্তায় বিদেশি কূটনীতিকের বেশে। কোনো বাড়িতে এক রাতের বেশি ঘুমাতেন না। এই দুর্ধর্ষ হামাস কমান্ডার আয়াশ সম্পর্কে আইজ্যাক রবিন একবার মন্তব্য করেছিলেন–

'I am afraid, he might be sitting between us here in the Knesset.'[১]

আয়াশ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা বানাতে পারতেন। সেই বোমার কতটা নিখুঁত বিস্ফোরণ সম্ভব, তাও বলে দিতেন সহযোদ্ধাদের। এ জন্যই তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল– 'দ্য ইঞ্জিনিয়ার'। হামাসের প্রথম আত্মঘাতী হামলাকারী ছিল রায়েদ জাকারনেহ। তার মতো আরও অনেক তরুণকে দিয়ে ইজরাইলি শিবিরে কাঁপন ধরাতে সক্ষম হয়েছিলেন আয়াশ।

---

১. Inside Hamas: The Untold Story of the Militant Islamic Movement, Zaki Chehab, page-55.

১৯৯৪ সালের অক্টোবরের উনিশ তারিখ। তেলআবিব স্কয়ারের কাছে এক আত্মঘাতী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। হামলাকারী ফিলিস্তিনি যুবক সালেহ নাজাল। তাতে ২২ ইজরাইলি নিহত ও ৪৮ জন আহত হয়। এই হামলা ইজরাইলের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ছুড়ে দেয়। দেশটির প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন লন্ডন সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরতে বাধ্য হন। তার উপস্থিতিতে শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জরুরি বৈঠক বসে। সিদ্ধান্ত হয়– আয়াশকে যেকোনো মূল্যে সরিয়ে দিতে হবে!

৯৪-৯৫ সালের দিকে ইজরাইলের ওপর নয় দফা বোমা হামলার জন্য দায়ী করা হয় কমান্ডার ইয়াহিয়া আয়াশকে। এসব হামলায় নিহত হয় অর্ধ শতাধিক ইজরাইলি। এরপরই তাকে খতম করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আসে। আয়াশকে হত্যার জন্য মৃত্যু পরোয়ানায় (Red page) সই করেন আইজ্যাক রবিন। অপারেশন সাকসেসফুল করার দায়িত্ব পড়ে ইজরাইলি নিরাপত্তা সংস্থা শিনবেত কর্মকর্তা ইজরাইল হ্যাসনের (Yisrael Hasson) ওপর। হ্যাসনকে এই দায়িত্ব দেন শিনবেতপ্রধান ইয়াকভ পেরি (Yaakov Peri)। হ্যাসন অবশ্য গড়িমসি করছিলেন, তবে তার শর্ত মেনে নেওয়া হলে দায়িত্ব নিতে সে রাজি হয়ে যায়।

কী সেই শর্ত?

আয়াশ হত্যার মিশনে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; খোদ প্রধানমন্ত্রী কিংবা শিনবেতপ্রধানও তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

জবাবে শিনবেতপ্রধান হ্যাসনকে বললেন–

> 'Yisrael, the entire agency is behind you, get going and bring the head of Ayyash.'[২]

রবিনের পর প্রধানমন্ত্রী হলেন শিমন প্যারেজ। দ্বিতীয় দফায় তিনিও আয়াশের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করলেন। এ সময় শিনবেতের নেতৃত্বে এলেন কারমি গিলন। এই গোয়েন্দা কর্মকর্তা আয়াশকে শেষ না করে দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। অভিযানে নামল ইজরাইলি গুপ্তচররা। আয়াশের বাবা-মা আর দুই ভাইকে বেশ কয়েকবার তুলে আনা হলো। চালানো হলো অকথ্য নির্যাতন। এক পর্যায়ে প্রায় বধির হয়ে গেলেন বাবা আব্দুল লতিফ। গ্রামের বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেওয়া হলো, কিন্তু কোনো কাজ হলো না।

এক পর্যায়ে ইজরাইলিদের মধ্যে এই ভীতি ছড়িয়ে পড়ল, নিশ্চয়ই আয়াশের সাথে ভূত-প্রেতের কানেকশন আছে! ১৯৯৫ সালে কিছু ইজরাইলি বুদ্ধিজীবী আয়াশকে 'ম্যান অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করলেন। কারণ হিসেবে তারা বললেন, সে ইজরাইলি জনগণ ও সরকারের ওপর প্রভাব তৈরি

---

২. Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, Ronen Bergman, page 438.

করতে পেরেছে। টিভি ও রেডিওতে সরগরম চলল আয়াশকে নিয়ে আলোচনা। স্ত্রী আশরার স্বামী আয়াশ সম্পর্কে বললেন–

> ‘আমি কারও সাথে খুব একটা দেখা করতাম না। যখন ঘুমাতাম, সব সময় মাথার কাছে হ্যান্ডগ্রেনেড ও একটা মেশিনগান রাখতাম। এসব চালানো আমি আগেই শিখেছি। যেহেতু আমাদের জীবনযাত্রা বিপদের মুখে, তাই যেকোনো ইজরাইলি রেইডের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকতাম। জানতাম, আমার স্বামীকে ধরার জন্য ইজরাইলিরা আমাকে ব্যবহার করতে পারে। সবাইকে সন্দেহ করতাম, কেবল একজন ছাড়া। আমার স্বামীর নির্দেশেই ওই ব্যক্তিটি আমার আর আমাদের ছেলের জন্য দিনে একবার খাবার নিয়ে আসতেন।
>
> আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, সেখানে একবার ইজরাইলি সেনারা রেইড দেয়। আত্মরক্ষার্থে চার বছরের ছেলেকে নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সন্তানও ব্যাপারগুলো বুঝত। সে আমার মুখ চেপে ধরেছিল, যাতে কোনো আওয়াজ না করি; অথচ আমারই তাকে শান্ত রাখার কথা ছিল। যখন সে সমবয়সিদের সাথে খেলত, কখনোই আমাদের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিত না।’[৩]

ইজরাইল হ্যাসন পরিচালিত আয়াশ হত্যার মিশনের নাম দেওয়া হলো– ‘অপারেশন ক্রিস্টাল’। তিনি শিনবেতের ইউনিটগুলোকে নির্দেশ দিলেন, ফিলিস্তিনিদের মধ্য থেকে ‘চর’ (ইনফরমার) নিয়োগ দিতে, যাদের কাছ থেকে তথ্য সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। মূল অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হলো শিনবেতের বার্ড ইউনিটকে। এরা কয়েক দফা কিলিং মিশন পরিচালনা করল, কিন্তু ব্যর্থ হলো প্রতিবারই। তবে তাদের কাজটা সহজ করে দিলো এক ফিলিস্তিনি বিশ্বাসঘাতক; কামাল হামাদ।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাস। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা। জাবালিয়া ও বেইত লাহিয়া ক্যাম্পের মাঝামাঝি এক বাড়িতে অবস্থান নিয়েছেন কাসেম ব্রিগেডের নেতা আয়াশ। সাথে বন্ধু ওসামা হামাদ। ওসামা হামাদের অপর এক বাসায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। সেখানে আগেও বেশ কবার আত্মগোপনে ছিলেন তিনি, কিন্তু বন্ধুর ইচ্ছায় এখানেই এলেন।

দুই বন্ধু প্রয়োজনীয় আলাপ সেরে নিচ্ছেন। ইজরাইলের বিরুদ্ধে আরও নিখুঁত ও বিধ্বংসী হামলার উপায় খুঁজছেন তারা। হঠাৎ বাবা-মা ও স্ত্রী-সন্তানের কথা মনে পড়ল আয়াশের। ওসামা জানালেন– আগের যে বাসায় তারা লুকোতেন, সেখানে ল্যান্ডফোনে আয়াশের বাবা আব্দুল লতিফ প্রায়ই ছেলের খোঁজ করতেন। ল্যান্ডফোনে সমস্যা থাকায় একটি মোবাইল নম্বর দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ছেলে সুযোগ পেলে যেন তাকে কল দেয়।

---

৩. Inside Hamas: The Untold Story of the Militant Islamic Movement, Zaki Chehab, page-58.

৫ জানুয়ারি, শুক্রবার। সকাল আটটায় ওসামা হামাদের চাচা কামাল হামাদ ওই বাড়িতে এলেন। সাথে নিয়ে এলেন একটি মোটোরোলা আলফা মোবাইল ফোন। এটা ভাতিজা ওসামার জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন তিনি।

সকাল নয়টায় মোটোরোলা ফোনে একটা কল এলো। ফোনটা কানে ধরতেই ওসামা বুঝলেন, আয়াশের বাবার ফোন। তিনি আইয়াশকে ডেকে ফোনটি দিলেন। বন্ধুকে বাবার সাথে নির্বিঘ্নে কথা বলার সুযোগ দিয়ে রুম ছেড়ে একটু দূরে গেলেন ওসামা। সাথে চাচা কামালও গেলেন। একা রুমে বাবার সাথে কথা বলছেন আয়াশ।

হঠাৎ মাথার ওপর দেখা গেল একটি ইজরাইলি হেলিকপ্টার।

ধুম!

বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। রুমের আসবাবপত্র ঠিকরে বেরিয়ে এলো বাইরে। চিৎকার দিয়ে দৌড় দিলেন ওসামা। রুমে এসে দেখলেন ফ্লোরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে প্রিয় বন্ধুর ক্ষত-বিক্ষত দেহ!

ওসামাকে উপহার দেওয়া ফোনটা চাচা কামালকে সরবরাহ করেছিল শিনবেত সদস্যরা। উদ্দেশ্য ছিল– ওসামার কাছে ফোনটি গেলে ঘটনাচক্রে বন্ধু আয়াশও এটি ব্যবহার করতে পারে। ইজরাইলি গোয়েন্দাদের ধারণা সঠিক হলো।

আয়াশ যখন বাবার সাথে কথা বলছিল, তখন মোবাইলে লাগানো ডিভাইসের মাধ্যমে ইজরাইলি গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়, ফোনটি এখন আয়াশের হাতেই। ফোনটিতে সংযুক্ত ছিল দূর নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সমিটার ও ৫০ কিলোগ্রাম ওজনের বোমা।

এর রিমোর্ট কন্ট্রোল ছিল মাথার ওপরে উড়তে থাকা ইজরাইলি হেলিকপ্টারটিতে। সেখান থেকেই ঘটানো হয় বোমার বিস্ফোরণ। গুঞ্জন আছে, ইজরাইলি গোয়েন্দারা ইনফরমার কামালকে মিলিয়ন ডলার অর্থ দিয়েছিল। নিরাপত্তার জন্য তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ইজরাইলের গোপন সেইফ হাউজে।

কামালের মতো গাজা, পশ্চিম তীর ও অন্যান্য আরব ভূখণ্ডেও হাজার হাজার ফিলিস্তিনি ইজরাইলের হয়ে কাজ করছে। গত তিন দশকে অন্তত ২০ হাজার ইজরাইলি এজেন্টের খোঁজ পায় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ। এই চরদের দেওয়া তথ্যেই দমানো হচ্ছে স্বাধীনতাকামীদের। আধুনিক সময়ে ফিলিস্তিনকে ঘিরে ইহুদি-আরবদের মধ্যকার যে সংঘাত, তার ইতিহাস দেড়শো বছরের বেশি নয়। ছোটোখাটো সংঘাত-দ্বন্দ্ব হতে হতে তা বড়ো আকারে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালে ইজরাইল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে তা আনুষ্ঠানিক লড়াইয়ে রূপ নেয়।